বারবার একই গর্ত থেকে দংশিত হবেননা

উপমহাদেশের মুসলিম ভাইদের প্রতি একটি আহবান

মুহাম্মাদ মিক্বদাদ

আল-কায়েদা উপমহাদেশের একজন মুজাহিদ

আন-নাসর মিডিয়া

নভেম্বর ২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উপর যার উপর প্রেরিত দ্বীন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের মুক্তির একমাত্র পথ।

এই প্রবন্ধের শিরোনাম সহীহ বুখারী ও মুসলিমের একটি প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে যেখানে নবী (ﷺ) বলেন,

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

"মু'মিন কখনও একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয়না।"

এ হাদিসের আলোচনায় উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেন – মু'মিনের একটি গুণ এই যে, মু'মিন কোন কিছু থেকে ক্ষতির শিকার হলে সেটাকে মনে রাখে, তা থেকে সতর্ক থাকে; অন্যভাবে বললে মু'মিন তার বা তার জাতির অতীত থেকে শিক্ষা নেয়; আর সে অনুযায়ী সচেষ্ট হয় যাতে সেও ঐ একই বিষয় থেকে ক্ষতির শিকার না হয়।

এজন্য, বলা হয়ে থাকে ইতিহাস বিশ্লেষণ দ্বীনি ইলমের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমি কোন ইতিহাস বিশ্লেষক নই, বিশ্লেষণ আমার কাজও নয়, আমি ইতিহাসের এক সাধারণ পাঠকমাত্র। যখন আমি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বর্বরদের জুলমের ইতিহাস পড়ি, তখন অন্তর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। আমি অনুভব করি, আমরা, সাধারণভাবে মুসলমান জাতি আর বিশেষভাবে বললে এই ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানেরা এখানে ধূর্ত ব্রিটিশ দুর্বৃত্তদের কুট-কৌশলের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারিনি।

গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে "মানবতা বিরোধী"[1] অপরাধের নামে একের পর এক জামায়েতে ইসলামী নেতাদের ফাঁসি এবং যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার ঘটনা দেখে এই বেদনা আরও গভীর হয়; কারণ আমাদের এই ভাইগুলো যদি পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর মত ব্রিটিশদের তৈরি মুরতাদদের বাহিনীকে চিনতে পারত, তাহলে তারা অনেকগুলো ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বেঁচে যেত।

এই বেদনা থেকেই এই প্রবন্ধটি লেখা।

বাংলা ভাষায় এমন কোন লেখা বা প্রবন্ধ এখন পর্যন্ত আমার দৃষ্টিতে আসেনি যা থেকে উপমাহদেশের মুসলিম উম্মত এ বিষয়ে শিক্ষা নিতে পারে। আল্লাহর শাহী দরবারে দরখাস্ত - তিনি যেন আমাকে এই ইতিহাস থেকে কমপক্ষে যেসব শিক্ষা অর্জন করা যেতে পারত, তার কিছু অংশ তুলে ধরার তৌফিক দেন।

এই প্রবন্ধে ব্রিটিশ দুর্বৃত্তদের কুটকৌশলের একটি দিকের উপর আমি বিশেষভাবে জোর দিব, সেই দিকটার উপর বাংলায় বিস্তারিত আলোচনা আমার জানামতে অনুপস্থিত। আর **এই কুটকৌশলটি হলঃ মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য মুসলমানদের প্রতি আবেগ ও সহানুভূতিহীন কিন্তু মুসলমান নামধারীদের ব্যবহার করে একটি সশস্ত্রবাহিনী গঠন আর এরপর এই বাহিনীকে ব্যবহার করে মুসলমানদের উপর জুলম চালিয়ে যাওয়া। ধোঁকাবাজ ব্রিটিশরা প্রথমে এই স্ট্র্যাটেজী ভারতীয় উপমহাদেশে প্রয়োগ করে সফল হয়ে যায়। ঔপনিবেশিক যুগের এই সফলতার পর, বর্তমান বৈশ্বিক কুফরের নেতারাও সমস্ত মুসলিম বিশ্বের উপরই এই একই স্ট্র্যাটেজীর প্রয়োগ করেছে। যার ফলস্বরুপ, আজ প্রায় সমস্ত মুসলিম বিশ্ব এমন মুরতাদ বাহিনীগুলোর কব্জায় রয়েছে।**

যেহেতু আমাদের আলোচনা এখানে বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশকে সামনে রেখে, তাই এই উপমহাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী মুরতাদদের বাহিনী - পাকিস্তান সামরিকবাহিনী - আমাদের আলোচনার ফোকাসে থাকবে।

[1] পূর্ব নির্ধারিত, পক্ষপাতদুষ্ট এবং অন্যায় এই বিচারপ্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষেপে জানতে হলে দেখুন উইকিপিডিয়া - 2012 ICT Skype controversy.

পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সাথে উপমহাদেশের সবগুলো দেশের সামরিকবাহিনীর প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ওতপ্রতোভাবে জড়িত। কারণ, এই সবগুলো সামরিকবাহিনীর বুনিয়াদ হল ব্রিটিশ ঐপনিবেষিক জলদস্যুদের বানানো British Indian Army। ১৮৫৭ এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এই বাহিনী তৈরি হয়েছিল ওয়ারেন হেস্টিংস ও রবার্ট ক্লাইভের মূলনীতি অনুযায়ী। সেই সময় এর নাম ছিল Presidency Armies; যার লক্ষ্য ছিলঃ ভারতীয় উপমহাদেশকে এর অভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমেই পরাজিত করা এবং উপমহাদেশে শরীয়তী আইনের জায়গায় ব্রিটিশ আইন প্রতিষ্ঠা করা এবং এর হেফাযত করা।

এই বাহিনীই পলাশী, বক্সারে মুসলমানদের পরাজিত করে এরপর শেরে মহীশুর টিপু সুলতানকে শহীদ করে। আর ১৮৫৭ সালের আযাদী আন্দোলনে হাজার হাজার উলামায়ে কেরামকে শহীদ করে!

স্বাভাবিকভাবেই, একটি প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে - ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে এরকম একটি সামরিকবাহিনী তৈরি করতে পারল, যারা ধর্ম, আঞ্চলিকতা কোন কিছুর পরোয়া না করে, নিজের ভাই বা নিজের প্রতিবেশীকে খুন করে, তার ধন-সম্পদ লুট করে, ব্রিটিশ প্রভূর সামনে সোপর্দ করবে? এর জবাব হল, এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল এই মূলনীতির উপর যে, এই বাহিনী কোন ধর্মীয় আদর্শের উপর লড়াই করবেনা; বরং লড়াই করবে নিজেদের বেতন-ভাতা ও পুরস্কার হিসেবে জায়গা-জমিন পাওয়ার লোভে – এক কথায় আমাদের বর্তমান সময়ের মানুষদের ভাষায় বললে নিজেদের ক্যারিয়ার (career) এর জন্য। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত বিশ্বাসে আর লড়াই হবে কোম্পানি বা ব্রিটিশ রাজার জন্য। নিজেদের দুনিয়ার সুবিধা লাভের জন্য, নিজেদের ভাইদেরকে হত্যা করতে তারা মোটেও চিন্তা করবেনা; চিন্তা হবে শুধু নিজেদের ক্যারিয়ার, পেশাদারিত্ব।

ফিরে আসি আমাদের ইতিহাসের আলোচনায়, শুরুতে Presidency Armies এর তিনটি ডিভিশন ছিল – বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বে। এই বাংলা ও বোম্বে ডিভিশনই বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর বীজ। ব্রিটিশ জেনারেল ও পরবর্তীতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কিচনার (Lord Kitchener) সময়ের সাথে সাথে এই বাহিনীকে ব্রিটেনের প্রয়োজনে পুনঃগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়, যার প্রধান লক্ষ্যই ছিল - খিলাফতে উসমানী ও রাশিয়াকে পরাজিত করে ব্রিটেনকে সুপার পাওয়ার বানানো। ইহুদীদের আরব ভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের লক্ষ্যই ছিল খিলাফতে উসমানীর পতন ঘটানো।

এজন্য প্রয়োজন ছিল ১০ লাখের বেশি সৈন্য, কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ সৈন্যের চালান কিভাবে হবে? এজন্যই ব্রিটেন British Indian Army এর পুনঃগঠন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই বাহিনীর ১৫ লাখ সৈন্য অংশ নেয় যার ৫০% ই ছিল নামধারী মুসলমান।

এই বাহিনী ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর, গ্রীস, ইরাকে সরাসরি খেলাফতে ওসমানীর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এই বাহিনীই ফিলিস্তিন ও ইরাককে মুসলমানদের হাত থেকে ছিনিয়ে মুসলমানদের সবচেয়ে কুখ্যাত দুশমন ব্রিটিশদের হাতে তুলে দেয়। এই বাহিনী সুদানে মাহদী আর্মিকে পরাজিত করে, ৩৫ হাজার মুজাহিদকে শহীদ করে, শরীয়তী শাসনকে ধুলিস্যাত করে, সুদানকে ব্রিটেনের পদানত করে।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, তাহলে একবার চিন্তা করে দেখুন, যে বাহিনী আমাদের শৈশব থেকে জেনে আসা বীর মুজাহিদ টিপু সুলতানকে রণাঙ্গনে শহীদ করে ... সিরাজউদ্দোলাকে নির্মমভাবে হত্যা করে ... মুসলমানদের প্রথম কিবলাহ জেরুজালেমকে ব্রিটিশ কাফেরদের হাতে তুলে দেয় ... সেই বাহিনীর সদস্যকেই আমরা কিভাবে নিজেদের জন্য বীরত্বের আদর্শ হিসেবে চিন্তা করতে পারব!

এখানে কিচনার কর্তৃক British Indian Army পুনঃগঠনের ভিত্তি সম্পর্কে কিছু বলা জরুরী মনে করছি। এই পুনঃগঠনের ভিত্তি ছিল মূলত ক্লজওভিটসের (Clausewitz)[2] মতাদর্শ। আগে এই বাহিনীর নিজের career নিয়ে চিন্তা করা ছাড়া তেমন কোন আদর্শ ছিলনা। কিন্তু ক্লজওভিটসের মতাদর্শ গ্রহণ করার পরে, অর্থ-সম্পদের সাথে সাথে এই বাহিনী নতুন এক দেবীর পূজা শুরু করে; এই দেবী হল দেশ বা রাষ্ট্র। ক্লজওভিটসের মতাদর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্য ছিল যাতে এই বাহিনী দেশভিত্তিক জাতীয়তার উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর মনোনীত মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় যুদ্ধ করতে পারে; নিজেদের রেজিমেন্টের ইতিহাসকে সামনে রেখে প্রেরণা লাভ করে।

যাদের পাঠ্যসূচীর বুনিয়াদই সেই British Indian Army এর মতাদর্শ, সেই পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সামরিকবাহিনী থেকে আমরা কি আশা করতে পারি? নিচের বাক্যটি আমার নয়, কুফফারদের সম্পাদনায় চলা উইকিপিডিয়া থেকে নেওয়াঃ

[2] ক্লজওভিটসের যুদ্ধের মূলনীতি ও দর্শনের উপর বিখ্যাত বই-'On War'।

The present-day Indian Army and Pakistan Army thus were formed from units of the pre-partition Indian Army. Both of these forces, and the Bangladesh Army which was created on the independence of Bangladesh, retain Indian Army traditions.[3]

পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর জুলম এর কথা এই লেখায় পরেও আসবে, কিন্তু এখানে কিছু প্রশ্ন না করে পারছিনাঃ British Indian Army এর উত্তরাধিকারী বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিবি (BGB) শুধু ক্যারিয়ারের জন্য, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানকে বাঁচানোর জন্য এক রাতে সহস্রাধিক উলামা, তালিবুল ইলম ও দ্বীন দরদী মুসলমানদের শহীদ করেছে - এটা কি কোন আশ্চর্যের বিষয়? অথবা এই উত্তরাধিকারী ভারতের আধাসামরিক বাহিনী বিএসএফ (BSF) এর সাথে মিলে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালিয়েছে – এটা কি অবিশ্বাস্য কোন বিষয়?

ফিরে যাই ১৯৪৭ সালে, British Indian Army থেকে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী গঠিত হয়, তখন এর প্রধান ছিল এক ব্রিটিশ জেনারেল, যার নাম ছিল ফ্রাঙ্ক ওয়াল্টার মেজারভি (Frank Walter Messervy)। এই কাফেরের উত্তরসূরি ছিল ডগলাস গ্রেসি (Douglas Gracey) যে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই বাহিনীর প্রধান ছিল। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, আশ্চর্যান্বিত হবেননা, তথাকথিত মুসলমান সেনাবাহিনী - যার স্লোগান "*ঈমান, তাকওয়া, জিহাদ*" - তার প্রথম দুই সেনাপ্রধানই দুইজন ব্রিটিশ জেনারেল! সাথে সাথে পর্যাপ্ত সেনা কর্মকর্তা নেই এই অজুহাতে, অনেক ব্রিটিশ সেনাকর্মকর্তাও রয়ে যায় এই সেনাবাহিনীতে।[4]

পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আবারও বলতে চাই, ১৯৭১ এরপর এই বাহিনী থেকেই তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতার অতীত ও বর্তমান ইতিহাস

পূর্বেই বলা হয়েছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী British Indian Army এর বর্বরতা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কখনই এই British Indian Army এর এসব জুলম-বর্বরতার থেকে নিজেদের মুক্ত ঘোষণা তো করেইনি, বরং তারা এটা বলে গর্ববোধ করে যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা এই বাহিনীর অংশ হয়ে যুদ্ধ করেছে । এই সেনাবাহিনীগুলো যে British Indian Army এর পাঞ্জাব রেজিমেন্ট, বেলুচ রেজিমেন্ট বা বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো থেকে সৃষ্ট এটা বলে তারা নিজেদের বীরত্বের ইতিহাসকে জাহির করতে চায়।

এখন চলুন নজর বুলানো যাক ১৯৪৭ সালের পরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জুলমের উপর।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশের উপর জুলম

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর মূল ক্রীড়নক সবসময়ই এর সেনাবাহিনী। ৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করে সামরিক শাসনজারি বা ৬৬ সালে ৬ দফা দাবীর সবদাবীই প্রত্যাখ্যানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অবদান ছিল। এরপর ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চ রাতে যে বর্বরোচিত গণহত্যা এই সেনাবাহিনী করেছিল, বস্তুত ঐ গণহত্যাই পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

পাকিস্তানের সাবেক শাসক, জেনারেল পারভেজ মোশাররফের মুখ থেকেই শুনুন, এই সেনানায়কের মতে পাকিস্তানের ভাঙ্গনের জন্য যে তিন ব্যক্তি মূলত দায়ী, তারা হল – জেনারেল ইয়াহিয়া, জুলফিকার ভুট্টো ও শেখ মুজিব। লক্ষ্য করুন, একজন পাকিস্তানি জেনারেল তার আত্মজীবনীতে লিখছে, পাকিস্তানের ভাঙ্গনের জন্য সবচেয়ে বড় অপরাধী তিনজনের মাঝে দুইজনই পাকিস্তানি এবং সবচেয়ে প্রথম অপরাধী ব্যক্তি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এক জেনারেল। এখানে উল্লেখ্য, জেনারেল মোশাররফ ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিল এবং সে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু তার আসার আগেই এই বাহিনী ভারতীয় লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণ করে। মোশাররফ তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করে যে, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১, তার জীবনের সবচেয়ে খারাপ দিন।

বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জুলমের প্রতিক্রিয়া

এত জুলম, বিশেষভাবে ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এর গণহত্যার পর, সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী মুসলমান এই চিন্তা করে - এই জালেম শাসকগোষ্ঠীর অধীনে থাকার আর কোন কারণ নেই। এজন্য তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও এর বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁরা এই যুদ্ধে কাদের দ্বারা পরিচালিত হন? তাঁরা কি তাঁদের এই আন্দোলন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন? মোটেই নয়! বরং তাঁরা সেই

[3] তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া - British Indian Army

[4] তথ্যসূত্র উইকিপিডিয়া - Military History of Pakistan

ক্ষমতার বলয় থেকে মোটেও বের হতে পারেননি, যে বলয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দুনিয়াকে চালাচ্ছে। বৈশ্বিক কুফরি ব্যবস্থার এই বলয়ের রয়েছে দুইটি কক্ষপথঃ এক কক্ষপথ চালায় পুঁজিবাদী আমেরিকা ও ব্রিটেন চক্র আর অন্য কক্ষপথ চালায় কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন[5]। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৯৬[6] সাল পর্যন্ত, পৃথিবীতে যতগুলো বিপ্লবী আন্দোলন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিল, সবগুলোই এই দুই কক্ষপথের যে কোন একটির ভেতরে থেকেই কাজ করেছে। বৈশ্বিক কুফরি ব্যবস্থা কখনও চায়না, কোন রাষ্ট্র এই দুই কক্ষপথের বাইরে চলে যায়। কারণ, কোন রাষ্ট্র এই দুই কক্ষপথের বাইরে যাওয়ার মানেই হল বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া। শুধুমাত্র মুজাহিদরাই কুফরি শক্তির এই বলয়কে চ্যালেঞ্জ করতে পেরেছে এবং তারা বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত, মুজাহিদরা ছাড়া আর কেউ এভাবে চিন্তা করতে পারেনি এবং মুজাহিদরা ছাড়া আর কেউ এই কুফরি শক্তির এই বলয়কে অতিক্রম করতে পারেনি।

ফিরে আসি আমাদের মূল প্রসঙ্গে, পাকিস্তান রাষ্ট্র এর জন্মলগ্ন থেকেই ইঙ্গ-মার্কিন জোটের তাঁবেদার। তাই, স্বাভাবিকভাবেই, ১৯৭১ সালের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব চলে যায় রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন কক্ষপথে; আর এ থেকে সবচেয়ে বেশি যে লাভবান হয়, সে হল হিন্দুবাদী রাষ্ট্র, ভারত। মুসলমানদের বিরুদ্ধে হাজার বছরের বিদ্বেষ থেকে, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন এই হিন্দুবাদী রাষ্ট্র এই সুযোগকে পুরোপুরি কাজে লাগায়। একজন অমুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, "১৯৭১ সালে, গান্ধী পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের সমর্থনে হস্তক্ষেপ করেন। ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক অধিপতি হওয়ার লড়াইয়ে ভারত বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়"।[7] ১৬ ই ডিসেম্বরের সেই চিত্রটি একবার স্মরণ করুন, যেখানে পাকিস্তান বাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী আত্মসমর্পণ পত্র তুলে দিচ্ছেন এক ভারতীয়র (লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার) হাতে - কোন বাঙ্গালীর হাতে নয়! ঐ প্রতীকী চিত্রই ১৯৭১ সালে, প্রকৃতপক্ষে কে বিজয়ী হয়েছিল তা তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট।

জামায়াতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলোর অবস্থান

অবশিষ্ট দ্বীনদরদী মুসলমানদের থেকে কিছু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রেণী ছিল, যারা আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলে বাংলাদেশ হিন্দুরাষ্ট্র, ভারতের গোলামে পরিণত হবে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও এর সেনাবাহিনীর রিদ্দার বিষয়টি বুঝতে না পারায়, তাঁরা পাকিস্তান বাঁচানোর জন্য লড়াই চালিয়ে যান। তাঁদের ধারণা ছিল পূর্ব বাংলার মুসলমানদের হিন্দুদের গোলামী থেকে বাঁচানোর সমাধানই হল পাকিস্তানকে বাঁচানো।

এই শ্রেণীগুলোর মাঝে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে দল সেটি হল জামায়াতে ইসলামী। হতে পারে সেই সময়ে তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এত জুলম দেখার পরেও তাদের রিদ্দা বুঝতে পারেননি ... হতে পারে তারা বিদ্রোহ না করে শুধু বাক প্রতিরোধের পন্থা বেছে নিয়েছিল ... তারা তাদের শক্তি শুধু ধর্মনিরপেক্ষতা ও ভারতের আধিপত্যের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল ... কিন্তু আজ এই ৪০ বছর পরে যখন দুনিয়া দুই মেরুতে অনেকখানি বিভক্ত হয়ে গেছে, যখন তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান তথা আজকের পাকিস্তান সুস্পষ্টভাবে আমেরিকা ও সাথে সাথে উপমহাদেশে ভারতের গোলামী কবুল করে নিয়েছে, এরকম পরিস্থিতিতেও তাঁদের পূর্বের সেই অবস্থান একেবারেই অনর্থক ও অগ্রহণযোগ্য। তাঁদের এই অবস্থান তাঁদের নিজেদের জন্য ও উপমহাদেশের মুসলিমদের জন্য এক আত্মঘাতি অবস্থান।

এখনও কি এটা উপলব্ধি করার সময় হয়নি যে, পাকিস্তান বা বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থাগুলো কুফরি শাসনব্যবস্থা যার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয; এটা উপলব্ধি করার সময় যেআসেনি এদের সামরিকবাহিনীগুলো মুসলিমদের বাহিনী নয় বরং মুরতাদদের বাহিনী? এখনও কি এটা উপলব্ধি করার সময় হয়নি যে, সত্যিকার ইসলামী আক্বীদাকে লুকিয়ে রেখে এবং বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থার নেতাদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য গণতন্ত্র চর্চা করে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়? ২০১৩ সালে মিশরে মুরসি সরকারের (যাদের আদর্শ এবং জামায়াতের আদর্শ একই) জোরপূর্বক ক্ষমতাচ্যুতি, সাথে সাথে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মর্মান্তিক পরিণতি; বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর উপর অবিরাম ক্র্যাকডাউন এবং নেতাদের ফাঁসি ও যাবজ্জীবন – এসবগুলো ঘটনা কি কোন উপদেশ বহন করেনা? এখনই এটা উপলব্ধি করার উপযুক্ত সময় - মিশর, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সামরিকবাহিনী মুরতাদদের বাহিনী এবং বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

---

[5] ১৯৯১ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন বলয় অনেক দুর্বল হয়ে যায় এবং আমেরিকার নেতৃত্বাধীন বলয় অনেকটা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু মুজাহিদদের প্রতিরোধের কারণে, বৈশ্বিক কুফর তার নীলনকশা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়।

[6] এই সালে এমন দুইটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যা এই দুই বলয়ের বাইরে। বলাই বাহুল্য এই দুইটি রাষ্ট্রই ছিল ইসলামী শরীয়তের উপর ভিত্তি করে। এক হল ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান ও অন্যটি ইসলামী ইমারত ককেশাস। এর মাঝে ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান ২০০১ সালে আমেরিকার আগ্রাসনের আগ পর্যন্ত আল্লাহর অনুমতিক্রমে ৫ বছরের মত ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। আর আল্লাহর ইচ্ছায় মুজাহিদরা এখন আবার এই ইমারত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করছে।

[7] Kulke, Hermann (2004). A History of India. Routledge. p. 359. ISBN 978-0415329194.

এখানে আমি ১৯৭১ সাল ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে তাঁদের অবস্থান নিয়ে কিছু বলব। সাধারণভাবে বললে, বৈশ্বিক কুফরের সর্দারদের খুশি রেখে দ্বীনি আন্দোলন চালাতে যেয়ে তাঁরা কখনই নিজেদের অবস্থানকে পরিষ্কার করতে পারেনি।

শুধুমাত্র গোলাম আযম ছাড়া আর কোন জামায়াত নেতাকে আমরা দেখিনি ১৯৭১ সালে নিজেদের অবস্থানকে খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছেন। গোলাম আযম যেমন পরিষ্কার করেই বলেছিলেন, বাংলাদেশ ভারতের গোলাম হয়ে যাবে এটা বুঝতে পেরেই মুক্তিবাহিনীর পক্ষ নিতে পারিনি; জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্য কোন নেতার কাছ থেকে আমরা এমন সুস্পষ্ট বিবৃতি দেখিনি।

গত বছর হিন্দুদের গোলামদের হাতে নিহত হওয়া মাওলানা মতিউর রহমান নিজামি (আল্লাহ তাঁর ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করুন ও তাঁর উপর রহম করুন) কখনও বলেছেন ১৯৭১ সালে তাঁদের অবস্থান ভুল ছিল। **গোলাম আযমসহ তাঁদের সবার অবস্থান তো নিঃসন্দেহে ভুল ছিল; কিন্তু ভুলটা কি ছিল? হিন্দুদের গোলামী থেকে বাঙালীদের বাঁচানোর চেষ্টা নাকি বাংলাদেশে শরীয়তের প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই না করা? এটা তাঁদের বিবৃতি থেকে সুস্পষ্ট হয়নি।**

হিন্দুদের গোলামদের হাতে নিহত অন্য এক নেতা আলী আহসান মুজাহিদ (আল্লাহ তাঁর ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করুন ও তাঁর উপর রহম করুন) বলেছিলেন ৭১ সালে কি করেছিলাম ভুলে গেছি।

আল্লাহ সেই মুসলিমদের উপর রহম করুন, যারা বুদ্ধিজীবী নামধারী - সেক্যুলার নরাধমদের - ১৯৭১ সালে হত্যা করেছেন। তাঁদের এই হত্যাকাণ্ডের ফলে, বাংলাদেশ একটি পরিপূর্ণ ধর্মহীন, প্রবৃত্তির পূজারী রাষ্ট্র হওয়া থেকে বেঁচে গেছে। এদের যে অংশ বেঁচে আছে তাদের কর্মকাণ্ডগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করুন; এই অবশিষ্টাংশের দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি বাংলাদেশের মুসলমানদের বিবেচনা করা উচিত; তাহলে তাঁরা বুঝতে পারবেন পুরো দলটা বেঁচে থাকলে বাংলাদেশের হাল কি হতে পারত!

এভাবে নিজেদের দ্বীনি অবস্থানকে লুকিয়ে এবং কুফরি শাসনব্যবস্থার প্রতিরোধ না করে জামায়াতে ইসলামীর এই নেতারা কি পেয়েছেন? সেই বিষয়ে বিস্তারিত একটু পরে আসছি, তার আগে দেখুন কুফর মিডিয়া তাদের অবস্থানকে বিকৃত এবং নিজের মত করে দেখানোর সুযোগকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে। মিডিয়ার প্রচারণায় বিশ্বাস করলে একজন সাধারণ মানুষের এটা অবশ্যই মনে হবে ঐ সময় যেসব যুদ্ধাপরাধ হয়েছিল সব হয়েছিল জামায়াতী আর উলামায়ে কেরামদের নেতৃত্বে। মানুষ মনে করে পাকিস্তানের ভাঙন প্রতিরোধের জন্য যারা কাজ করেছে, তারা সবাই রাজাকার, অথচ বাস্তবে, রাজাকার ছাড়া আরও কিছু সংগঠন এর পেছনে ছিল।

যুদ্ধাপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী ছিল যে সংগঠন, সেটি ছিল 'রেজাকার'। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল সাধারণ বিহারি ও অরাজক পরিস্থিতিতে লুটপাটের সুযোগ সন্ধানী বাঙালী। মিডিয়া সবসময় এটাই দেখাতে চায় যে, জামায়াতে ইসলামীর উচ্চ পর্যায়ের নেতারা এই সংগঠনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, অথচ বাস্তবে, এই সংগঠনের পরিচালককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল 'Office of Public Safety'[8] নামের যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান[9]।

মিডিয়া কখনও এসব জানাবেনা যে, গোলাম আযম দুইবার রেজাকার নামের এই অপরাধী সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের নসিহত করার জন্য; আর এও বলেছিলেন তোমরা জুলম করা থেকে বাঁচ, আল্লাহ জালেমদের সাহায্য করেননা।[10] কখনও তারা বলবেনা গোলাম আযম ৬ দফার মাঝে ৪ দফা মেনে নিতে আইয়্যুব খানকে অনুরোধ করেছিলেন বা ৫২ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে শামিল ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র ইউনিয়ন (ডাকসু) এর জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে ১৯৪৭ সালে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কাছে ইউনিয়নের পক্ষ থেকে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন[11]। জেনারেল আইয়ুব খান তাঁকে কোন বিচার ছাড়াই আট মাস জেলে কয়েদ করে রেখেছিল।

এসব কিছুর পরও, ৭১ সালে যুদ্ধাপরাধের জন্য প্রধানত যে সংগঠনকে দায়ী করা হয় সেটি হলঃ জামায়াতে ইসলামী! মুসলিম লীগের নাম আপনারা এত নিয়মিত শুনতে পাবেননা। কারণ, মুসলিম লীগ তো আর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চায়না। অন্যদিকে, জামায়াতে ইসলামী শরীয়ত প্রতিষ্ঠার

[8] The Office of Public Safety (OPS) একটি অ্যামেরিকান সরকারী সংস্থা। এটি অফিসিয়ালি USAID (US Agency for International Development) এর অংশ এবং CIA (Central Intelligence Agency) এর সাথে সংশ্লিষ্ট।

[9] L. Lifschultz, Bangladesh: The Unfinished Revolution, Zed Press, 1979, p. 123.

[10] গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েকদিন আগে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের সাথে গোলাম আযমের কথোপকথন যা এটিএন বাংলা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই কথোপকথনের উদ্দেশ্য ছিল গোলাম আযমকে হীন ও প্রশ্নবানে বিদ্ধ করা।

[11] I. Hossain, N. Siddiquee, 'Islam in Bangladesh Politics: the role of Ghulam Azam of Jamaat-i-Islaami', Inter-Asia Cultural Studies, Vol 5, 2004, p. 385

জন্য কাজ করে; তাই তাঁরা কাফেরদের পন্থায় কাজ করুক আর না করুক, বৈশ্বিক কুফরিব্যবস্থা এর কোন পরওয়া করেনা। তাদের কাছে জামায়াতের আসল অপরাধঃ তাঁরা শরীয়ত চায়। জনসাধারণকে দেখান হয় আলবদর, রাজাকার এসব একই রকম সংগঠন; এদের মাঝে কোন ফারাক নেই।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, যদি আমরা দাওয়াতের মূল বিষয়বস্তুকেই প্রকাশ করতে সংকোচ বোধ করি, তাহলে আমরা কাফের মিডিয়ার বিকৃতির সহজ শিকারে পরিণত হব।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বর্তমান একজন নেতা তো খোলাখুলিভাবে বলেই দিয়েছিলেন, জামায়াতে ইসলামীকে এখন স্ট্র্যাটেজীর কারণে খোলাখুলিভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দাবী থেকে সরে আসা উচিত! আমরা যদি এই পথে আরও চলি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমরা হয়ত ভাবতে পারি, ইসলাম শব্দটিও সংগঠনের নাম থেকে বাদ দেওয়া দরকার। আল্লাহই জানেন কেন আমরা কুর'আনের এই সহজ-সরল বাণীর প্রতি মনোযোগ দেইনাঃ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

অর্থঃ " ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।"[12]

উপরের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, ১৯৭১ সালে এবং এরপরে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থানে বেশ কিছু ভুল ছিল; আর সাথে সাথে এও পরিষ্কার যে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য কোন রক্তচক্ষুকে পরোয়া না সত্য প্রকাশ করা ও এসব রক্তচক্ষুকে জবাব দেওয়ার জন্য মুরতাদ নয়, মুসলমানদের নেতৃত্বে জিহাদের কোন বিকল্প নেই।

কথাগুলো আরও পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য নিচে আমরা পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর বর্বরতার বর্তমান ইতিহাস নিয়ে কিছু আলোচনা করব।

বেলুচিস্তান ও প্রাক্তন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর অত্যাচার ও তার প্রতিক্রিয়া

বেলুচিস্তান

পাকিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে যারা কমবেশি ধারণা রাখেন তাঁরা সবাই জানেন, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিকবাহিনীর উপরস্থ নেতাদের সিংগভাগই হয় পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি, জেহলাম, চাকওয়াল ও খায়বার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বুনের ও কোহাট[13] থেকে[14]। পূর্ব বাংলার উপর এই শাসকগোষ্ঠী যেরকম জুলম করেছিল, একইরকম জুলম তারা আজ বেলুচিস্তানের উপর করছে। স্বাভাবিকভাবে, বেলুচিস্তানের জনসাধারণ এটা মেনে নিতে পারছেনা। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে আন্দোলন তৈরি হয়েছে, পুঁজিবাদী কক্ষের বিপরীতে সমাজতান্ত্রিক কক্ষ তা নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য বাঙালী মুক্তিবাহিনীর মত এখানে তৈরি করেছে বেলুচ মুক্তি বাহিনী (Baloch Liberation Army)। আলহামদুলিল্লাহ, সমাজতান্ত্রিক জাহিলীয়াতের প্রেরণায় চালিত এই আন্দোলন জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

আমার বাঙালী ভাইয়েরা, একবার ভেবে দেখুন। আমরা ইতিহাসের বইয়ে যেমন পশ্চিম পাকিস্তানের বা পাঞ্জাবীদের জুলমের কথা পড়ি, আর এরই ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান বা পাঞ্জাবের মুসলমান জনসাধারণ সম্পর্কে আমরা বিদ্বেষ পোষণ করতে শুরু করি। বেলুচিস্তানের এই অবস্থা থেকে, আশা করি আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন যে, এই ঘৃণা বা বিদ্বেষ সম্পূর্ণ অমূলক। বাংলাদেশ বা বেলুচিস্তানে এই জুলমের পেছনে রয়েছে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তথা সামরিকবাহিনীর মূল ক্রীড়নকেরা - পাকিস্তান বা পাঞ্জাবী জনসাধারণ নয়।

Federally Administrated Tribal Area

এবার আমি কিছু কথা বলব, FATA অর্থাৎ খায়বার পাখতুন খাওয়া প্রদেশ সংলগ্ন কাবায়েল বা গোত্রভিত্তিক অঞ্চল এবং সোয়াতের ব্যাপারে। এই অঞ্চলগুলো মুজাহিদদের জন্য বরাবরই খুব উর্বর অঞ্চল। ব্রিটিশ সরকার কখনই এই অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। তাঁরা বেশ সফলভাবেই

---

[12] সূরা আল-বাক্বারাহঃ ১২০

[13] প্রকৃতপক্ষে 'কোহাট' ১৯০১ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবের অংশ ছিল। ১৯০১ সালে যখন জর্জ কার্জন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ গঠন করে, তখন এই জেলাকে নতুন এই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

[14] এই জায়গাগুলো থেকে আসা মুরতাদ বাহিনীর সদস্যেরা ব্রিটিশ রাজের এতটাই অনুগত ছিল যে, এই জায়গাগুলোকে সমষ্টিগতভাবে বলা হত, Sword of British Kingdom. আর এ জায়গার মানুষদের জন্য ঘোষণা করা হয় আলাদা বর্ণ, যার নাম দেওয়া হয় Martial Race।

ব্রিটিশ বাহিনীর মোকাবেলা করেছিলেন এবং ব্রিটিশ সরকার কখনই এই জায়গাগুলো নিয়ন্ত্রণে নিতে পারেনি। মাওলানা মহিউদ্দিন ওরফে মোল্লা পাওয়ান্দাহ উনিশ শতকের শেষ দিকে এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন। ভাইসরয়, জর্জ কার্জন, তাঁকে "এক নাম্বার সন্ত্রাসী" হিসেবে আখ্যা দেন।

অবশেষে, ১৯০১ সালে, জর্জ কার্জন এক চুক্তির আওতায় এই অঞ্চলগুলোকে স্বায়ৎশাসন দেয় এবং সরকারের সাথে কবিলা বা গোত্র সর্দারদের সাথে সমন্বয়ের জন্য একজন Political Agent নিযুক্ত করে। কিন্তু এসব করেও ব্রিটিশরা ওয়াজিরিস্তানের মুসলমানদের জিহাদ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তারা ব্রিটিশদের সাথে চুক্তিতেও বিশ্বাসী ছিলনা; তাই তারা ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারি রাখে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ দিকে, হাজী মির্জা আলী খান ওরফে ফকির এপি তাদের এই আন্দোলনের কাণ্ডারি ছিলেন।

১৯৪৭ সালে "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" স্লোগানের ধোঁকায় পড়ে উপমহাদেশের কোটি কোটি মুসলমানদের মত, বেশির ভাগ কাবায়েলী বা গোত্রীয় মুজাহিদরা পাকিস্তানের অধীনে স্বায়ত্তশাসনকে মেনে নেন, এই আশায় যে পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্র হবে, এখানে শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে তাঁদের নেতা ফকীর এপি শরীয়তের জন্য জিহাদ চালিয়ে যান। এজন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরেই, ব্রিটিশ জেনারেল ডগলাস গ্রেসির নেতৃত্বে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী ওয়াজিরিস্তানে বিমান হামলা চালায়। প্রতারক পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী শরীয়ত তো কায়েম করেইনি বরং ২০০১ সালে মুসলিম উম্মতের সাথে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে, এই অঞ্চলের মুসলমানদের কাছে তাদের রিদ্দা ও ধোঁকা পরিষ্কার হয়ে যায়।

তাই, তাঁরা আবার জিহাদে ঝাপিয়ে পড়ে। তাঁরা কিছু ভুলত্রুটি করলেও, এটা মানতেই হবে তাঁরা এখনও পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাচ্ছে আর পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী তাদের উপর অবর্ণনীয় জুলম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে সোয়াতে গণহত্যা, ২০০৯ সালে দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান ও ২০১৪ সালে উত্তর ওয়াজিরিস্তান থেকে শত শত পরিবারকে উদ্বাস্তু করে, নিজের দেশের মানুষকে ড্রোন ও যুদ্ধ বিমানের বোমাবর্ষণের লক্ষ্য বানিয়ে, এই বাহিনী জুলমের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। এসব অঞ্চলগুলোতে পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান থেকে যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করা হয়েছে, তা কোন রাষ্ট্রের নিজের ভূমিতেই নিজস্ব বিমান বাহিনীর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অপারেশন।

এই যুদ্ধ এখনও জারি আছে এবং মুহাজিদরা সাহসিকতার সাথে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে এখনও পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর মোকাবেলা করে যাচ্ছে। আর ঐসব এলাকার সাধারণ জনগণ এত প্রতিকূলতার পরেও মুজাহিদদের সাথ দিয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ, শীঘ্রই এই জালেম বাহিনী এখানে দৃষ্টান্তমূলক পরাজয়ের মুখোমুখি হবে। আর এই পরাজয় শুধু পাকিস্তান সামরিকবাহিনীর জন্য নয় বরং পুরো বৈশ্বিক কুফরি শাসনব্যবস্থার - যার নেতৃত্বে আছে আমেরিকা – জন্য হবে এক পরাজয়। এজন্য কুফরের সর্দার আমেরিকাও এই বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে।

এভাবেই, আল্লাহ তাআলা এই কাবায়েলী মুজাহিদদের (ওয়াজিরী, মেহসুদী ও অন্যান্য) সম্মান দিয়েছেন। আর যারা কুফরের সর্দারদের খুশি রেখে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কাফেরদের প্লেটে সাজানো খাবার হওয়ার পরিণতি বরণ করছেন।

অবুঝ ভাইদের পরিণতি

ধর্মান্ধ হিন্দুরাষ্ট্র, ভারতের মোকাবেলায় যারা এই পাকিস্তান বাহিনীর নেতৃত্বকে বাছাই করেছিলেন, তাঁদের পরিণতি দিকে একবার চোখ না বুলালে আসলে এই আলোচনা অপূর্ণ থেকে যাবে।

কাশ্মীরী মুজাহিদীন

কাশ্মীর জিহাদী আন্দোলনের ভিত ছিল পাকিস্তান ভূখণ্ডে। আর এই ফায়দা নিয়ে পাকিস্তান সামরিকবাহিনী নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এই জিহাদী আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে। যার ফলস্বরূপ সুদীর্ঘ ৭০ বছর অতিবাহিত করার পরেও, এই আন্দোলন এখনও ৭০ বছর আগে যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে, হিন্দু রাজার জুলম থেকে কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে বাঁচানোর জন্য কাবায়েলী মুজাহিদরা (ওয়াজিরী, মেহসুদী ও অন্যান্য) যে ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, ঐ ভূখণ্ডই এখন পর্যন্ত এই শাসকগোষ্ঠী 'আজাদ কাশ্মীর' নামে শোষণ করে যাচ্ছে। ১৯৪৭ সালে যুদ্ধের সময় নিজেরা তো কোন ভূখণ্ড অর্জন করতে পারেইনি, বরং ব্রিটিশ প্রভূদের তাবেদারি করে মুজাহিদদের অগ্রযাত্রাকে আরও রোধ করেছে।

আর নব্বইয়ের দশকে মুজাহিদরা যখন নতুন করে কাশ্মীরকে মুক্ত করার জন্য জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত নিজেদের ইচ্ছামত মুজাহিদদের ব্যবহার করেছে; কাশ্মীরকে স্বাধীন করে শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করা তো বহু দূরের কথা, বরং ভারতকে সামরিক ও অর্থনৈতিক চাপে রাখার লক্ষ্য নিয়ে আমেরিকার ১০০% গোলামী করে গেছে। যার ফলস্বরূপ এই ৭০ বছরে ঝরেছে শুধু মুজাহিদ ও মুসলিম জনসাধারণের

রক্ত আর কাশ্মীরের মুসলমানদের রাজনৈতিক অর্জন হয়েছে শুণ্য। বিগত এক দশকে, আমেরিকা যেমন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের আধিপত্যকে মেনে নিয়েছে, তার ধারাবাহিকতায় এই শাসকগোষ্ঠীও এখন ভারতের সাথে নতজানু পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন শুরু করেছে। ২০০৩-২০০৪ সালে আমেরিকার নির্দেশে এরা কাশ্মীরী মুজাহিদদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়েছিল, কাশ্মীরী মুজাহিদদের মানসেহরা এবং মুজাফফরাবাদের ক্যাম্পে নজরবন্দি করে রাখে এবং কাশ্মীরী মুসলমানদের যুদ্ধের ময়দানের ভেতরে হিন্দুদের দয়া ও করুণার জন্য ছেড়ে দিয়ে আসে।

কাশ্মীর মুজাহিদদের কিভাবে এই বাহিনী নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করত তার একটি উদাহরণ আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই যা আমি একজন বিশ্বস্ত প্রাক্তন কাশ্মীর মুজাহিদের কাছ থেকে শুনেছিলাম, যিনি বর্তমানে আফগানিস্তানে আমার একজন শ্রদ্ধেয় সহযোদ্ধা। উনার ভাষ্যমতে, যখন মুজাহিদরা কাশ্মীরের কোন ভূখণ্ড বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে চলে যেত, তখনই আমেরিকার হুকুম মোতাবেক পাকিস্তান সামরিকবাহিনী ভারতের সাথে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়ে সীমান্ত বন্ধ করে দিত। যুদ্ধবিরতির ঘোষণায় নিশ্চিন্ত হয়ে ভারতীয় সেনারা তখন নিজেদের শতভাগ শক্তি প্রয়োগ করার সুযোগ পেত মুজাহিদদের উপর। এদিকে সীমান্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুজাহিদদের রসদের পথ হয়ে যেত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। অবস্থা এমন হয়ে যেত যে, যতগুলো কালাশিনকোভ বুলেট তাঁদের কাছে থাকত, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক শত্রুসেনা তাঁদের সামনে মুখোমুখি থাকত।

ঘৃণ্য এই শাসকগোষ্ঠী কাবায়েলী মুজাহিদদের অর্জিত বিজয়ের ফসলকে ১৯৪৭ সাল থেকে নিজেদের দেশের সাথে মিলিয়ে শোষণ করে যাচ্ছে; আর ১৯৯০ সাল থেকে ভারতের সীমানার ভেতরে মুসলমানদের জুলমের হাত থেকে বাঁচানোর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে উম্মতকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। যার ফলস্বরুপ, কাশ্মীরের মুসলমানরা হিন্দুদের জুলম থেকে নিজেদের বাঁচানোর আর কোন রাস্তা পায়নি।

জামায়াতে ইসলামী

আমার এই প্রবন্ধে, জামায়াতে ইসলামী দ্বারা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ – এই দুইটি সংগঠনই উদ্দেশ্য। ১৯৭১ এর পূর্বে এ দুইটি মূলত একই সংগঠন ছিল; এরপর বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরে তারা আলাদা হলেও তাঁদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি একই থেকে গেছে। দুই দেশেই এই সংগঠন এখনও তথাকথিত 'ইসলামী গণতন্ত্রের' মাধ্যমে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর ১৯৭১ সালে এই সংগঠনের অবস্থান কি ছিল তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে; এক কথায় বললে, তাঁরা মনে করেছিলেন উপমহাদেশে ইসলাম বাঁচানোর জন্য জরুরী হল পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বাঁচানো।

এর পরিণতিস্বরূপ তাঁরা কি পেয়েছেন? পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের সব বিচারপ্রক্রিয়া যাচ্ছে এই সংগঠনের বাংলাদেশ শাখার উপর দিয়ে। উচ্চপর্যায়ের সব নেতাদের ফাঁসি অথবা ১৯৭১ সালে যে নেতা দলটির সাথেই ছিলেননা, তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়ে পুরো সংগঠনকেই নেতৃত্বশুণ্য করে দিয়েছে। আর ঘোষণা ছাড়াই কার্যত নিষিদ্ধ করা হয়েছে সংগঠনটিকে। সংগঠনটির পাকিস্তান শাখার ভাইয়েরা এ থেকে শিক্ষা নিতে না পারলে হয়ত কিছুদিন পরে তাঁদেরকেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অথবা ইখওয়ানুল মুসলিমীন মিশরের পরিণতি বরণ করতে হতে পারে।

ইতিহাস থেকে উপেক্ষিত শিক্ষা

সম্মানিত পাঠক, প্রবন্ধটির শুরুতেই সমস্ত মুসলিম উম্মতের জন্য আর বিশেষভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি আহবান ছিলঃ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়া, এবং বারবার একই ভুল করা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানো। আশা করি এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, পুরো প্রবন্ধ পড়ার পর পাঠকমণ্ডলীর কাছে ইতিহাস থেকে উপেক্ষিত শিক্ষাগুলো কি কি ছিল তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপরও এখানে আমি সেই শিক্ষাগুলো সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবঃ

- বর্তমান সময়ের মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় বাহিনীগুলো সবই মুরতাদদের বাহিনী। তারা এক মিথ্যা মা'বুদ বা ইলাহের পূজা করে যার নাম হল রাষ্ট্র বা দেশ। তারা বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থার বর্ম ও অস্ত্র হিসেবে কাজ করে। বৈশ্বিক কুফরী ব্যবস্থা এদের মাধ্যমে উম্মাহর বিরুদ্ধে প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্বমূলক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে এই উম্মতের আওলিয়া ভাবার কোন সুযোগ নেই।
- উম্মাহর জন্য জরুরী হল এর বন্ধু ও শত্রুকে চেনা। যদি তারা এটা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদেরকে এই ভুলের মাশুল দিতে হবে; যেমনটা আল্লাহ বলেনঃ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ﴾

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।[15]

- উম্মতের মর্যাদা জিহাদের মাঝেই নিহিত। যদি উম্মত এই ফরয এবং এর জন্য প্রস্তুতিকে ছেড়ে দেয়, তাহলে উম্মত অপমানিতই হবে এবং কাফেররা এর সাথে ছিনিমিনি খেলবে।উম্মতের উচিত নিজের দ্বীনের উপর গর্ব করা। উম্মাহর সফলতা কপটতা বা দ্বিমুখীতা এবং তথাকথিত "ইসলামী গণতন্ত্র" এর মাঝে নেই। আমাদের উচিত সত্যকে সরাসরি ও পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করা; যেমটা আল্লাহ বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।[16]

- জিহাদের নেতৃত্ব অবশ্যই থাকা উচিত মুজাহিদদের হাতে, এবং এই নেতৃত্ব অবশ্যই মুরতাদ সামরিকবাহিনী দ্বারা পরিচালিত হলে চলবেনা। জিহাদকে যদি এসব মুরতাদ বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই জিহাদ থেকে উম্মত কোন ফলই পাবেনা; এর মাধ্যমে বৈশ্বিক কুফরিব্যবস্থার নীল নকশাই বাস্তবায়িত হবে।

আর আমাদের সর্বশেষ বাণী, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য"।

আপনাদের একনিষ্ঠ দু'আয় আমাদেরকে ভুলবেননা।

AN-NASR

[15] সূরা আলে ইমরানঃ ১১৮

[16] সূরা আল-আহযাবঃ ৭০